মুক্তিযোদ্ধার প্রতিকৃতি

যুদ্ধ শেষ, বিজয় খরচ, কান্না কেবল অবশিষ্ঠ

ফারুক ওয়াসিফ

মার্চ বা ডিসেম্বর তো বটেই, বছরের বাকি সময়েও সংবাদপত্র এবং দৃশ্যমাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্দশার সংবাদ বেশ একটা উপভোগ্য বিষয়ে পরিণত হয়। করুণ দৃশ্য ও আবেগী ভাষা মানুষের মনকে নরম করে। এভাবে সেটাও একটা উপভোগের বিষয় হয়ে ওঠে। এ কারণেই 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' যাত্রা বা 'বেদের মেয়ে জ্যোছনার' করুণ কাহিনী জনপ্রিয় হয়। যে সিনেমা যতবেশি দর্শকের যত ফোঁটা বেশি চোখের জল ফেলাতে পারে সেই সিনেমা তত বাজার পায়। আজকাল মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন-সংগ্রামের করুণ কাহিনীর যে কদর প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, তার কারণও কি এই করুণ রসের মানসিক অর্থনীতি? মঞ্চে বা ছাপা কাগজে আর টিভির পর্দায় এত যে অশ্রুবর্ষণ, তা কি তবে জনতোষণের নতুন ফন্দি? জনগণের আবেগকে উস্কে দেয়ার মোহনীয় আয়োজন? হতে পারে কিন্তু।

কিন্তু যারা এটা করেন, তাদের কী লাভ? রাজনীতিকদের না হয় ভাবমূর্তি গঠনে নিজ মুর্তির সঙ্গে মহান মহান ভাবের সামিয়ানা লাগাতে হয়, কলাম লেখকদের না হয় রচনাকে ওজন দেয়ার জন্য করুণ রসের জোগান দিতে হয়, কিন্তু এত করুণ রস নিয়ে সাংবাদিকদের কী কারবার। মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্দশাকে বারবার সামনে এনে তাদের কী লাভ! উত্তরটি খুবই সোজা। কারণ, এরকম কাহিনী পাঠকরা পড়তে পছন্দ করে। দায়িত্ব কর্তব্যের কথা বাদ দিলে, যাহা পাঠক প্রিয় তাহাই সাংবাদিকতার খোরাক। সুতরাং পাঠক চায় বলেই, অমুক পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার অসহায়ত্ব, অমুক গরিব মুক্তিযোদ্ধার না খেয়ে থাকা, অমুক মুক্তিযোদ্ধা ভিক্ষা করছে ইত্যাদি প্রচার করা।

এটা যদি মানি, তবে এই সত্যের ভেতরের তিতা শাঁসটিতেও জিভ ঠেকাতে হয়, তাকেও মানতে হয়। চাই কি না চাই, সত্যের আঁটি তিতাই হয়– অনেক সময়। সেই তিক্ত সত্যটি হলো, স্বাধীন দেশের মানুষ তাহলে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি করুণা দেখানোতে আনন্দ পান! উন্নত বিশ্বের মানুষ যেমন বাংলাদেশ বলতেই বন্যা আর পেটফোলা-পাছাচিকন শিশু আর ছিন্নবস্ত্র ক্ষুধার্ত নারী বোঝে, তেমনি আমরাও কি মুক্তিযোদ্ধা বলতে এক ব্যর্থ ও অসহায় চরিত্রের ছবিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। মানি বা না মানি এটা এখন বাস্তব। বাংলাদেশে এটাই মুক্তিযোদ্ধার 'জাতীয়' প্রতিকৃতি।

এই বাস্তবের ভেতরে জনমনস্তত্ত্বের অন্য একটা দিকও উন্মোচিত হয়। জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের এমন মুর্তিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন যে, মুক্তিযোদ্ধারা আপস করেন নাই। স্বাধীনতার সুযোগ সুবিধা নেন নাই। তারা যেমন একাত্তরেও সৎ ছিলেন, আজো তাই। যে মধ্যশ্রেণীর সাংবাদিক-লেখকেরা মুক্তিযোদ্ধাদের দুঃস্থ্য ভাবমূর্তি তুলে আনেন, তাদের মনের কথাও অনেকটা এরকম। তাদের অনেকেরই অবস্থা ভাল। কিন্তু অনেকের মনের গহীনে হয়তো একটা অপরাধবোধ কাজ করে যে, দেশের ওপর যাদের হক বেশি, তাদের প্রতি ইনসাফ করা হয়নি। তাই এরকম করুণ গাথা পরিবেশন করে তারা ভাবেন, 'যাক, একটা দায়িত্ব তো পালন করা গেল'! এভাবে বিবেককে শান্ত রাখা যায়, পরিষ্কার রাখা যায়– যদি এই কলিকালে সেটা থেকে থাকে।

তবে, এটা বলা সত্যের বরখেলাপ হবে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার নায়কদের সকলের অবস্থাই করুণ। মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকের অবস্থাই সাধারণ জনগণের থেকে অনেক অনেক ভাল। একজন মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি হয়েছেন, মন্ত্রী হয়েছেন বেশ ক'জন। বড় আমলা বা সচিবও হয়েছেন অনেকে। দেশের বিত্তবানদের মধ্যে অনেকে আছেন মুক্তিযোদ্ধা। সুপ্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদ, আমলা, সচিব, ব্যবসায়ীসহ এমন ক্ষেত্র কম পাওয়া যাবে যেখানে তারা নাই। এমনকি '৭১-এ জনগণ ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকারী জাতীয় শত্রু জামায়াতে ইসলামেও মুক্তিযোদ্ধা নেতা আছেন। দেশের বেশ ক'জন প্রখ্যাত গডফাদারও মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন। এরা সফল মুক্তিযোদ্ধার প্রতীক। এদের চেতনার কাঠখড়ে আর আগুন জ্বালানো যাবে না। জ্বলবে না, নানান আরামের রসে সেটা ভিজা।

তা যদি না হবে তো বাংলাদেশের অবস্থা এমন কেন? কোথায় গেল সোনার বাংলার প্রতিশ্রুতি? কারা খেয়ে ফেললো সেটা? শুনি তো বিদেশীরা আর নাই, দেশ চালায় দেশবাসী– বহুদিন থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।

তারপরও এসকল সফল মানুষদের নিয়ে করুণা করার সাহস এমনকি দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধারাও পাবেন না। সহ্যও করা হবে না। কিন্তু এদের কথা বলা হয় না কেন? কেন দেখানো হয় না যে, সফল ও কামিয়াব ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদেরও একটা অংশ আপন মহিমায় জ্বলজ্বল করছেন! সত্যের গোড়া এখানেই পোঁতা। স্বাধীনতার সুফল যখন গরিষ্ঠভাগ জনগণ পান না, তখন ব্যক্তি মুক্তিযোদ্ধার সফলতা ব্যক্তিগত সফলতা। সেই সফলতাকে তারা সামনে আনতে নারাজ– কুণ্ঠা হয়। জনগণের কথা বাদ দিলাম, সহযোদ্ধাদের কাছে জবাব দিতে হবে না? সোনার বাংলা গড়ার শপথ কতটুকু পালিত হলো তার পরিমাপ হবে না? তাই তারা নীরবে সফল হয়ে চলেছেন তো চলেছেনই। তাদের এই সফলতার ভাগীদার জনগণ নন– দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধারা তো ননই। বাড়াবাড়ি হলেও সত্য যে, যতদিন না দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধারা মরে ভূত হয়ে যান বাংলাদেশের মানুষ ও ইতিহাস ততদিন এদের এ সফলতাকে সন্দেহ করবে। কেননাই ওই পরাজিত ও হতাশ মূর্তিই যে মুক্তিযুদ্ধের আজকের পরিণতি সেটা কি মানুষ হাড়ে হাড়ে জানে না? জনগণের মনের মুকুরে চাপা থাকা আবেগের হ্রদ যতদিন না শুকাবে, ততদিন ব্যক্তিগতভাবে সফল মুক্তিযোদ্ধার ব্যক্তিগত স্বীকৃতির সুযোগ বাংলাদেশে সীমিত।

সত্যিই তো এটা কীভাবে হলো? যা কিছু বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় বীরত্বের প্রতীক, তার সব কেন এত করুণ রসে সিক্ত? বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রথম বীরত্ব ছিল ভাষা আন্দোলনের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভিত কাঁপিয়ে দেয়া। এর পরে আসে ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের দাবানল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের খোলনলচে তাতেই পুড়ে খাক। কাঠামোটা দাঁড়িয়েছিল। তাকে ভাঙতে যুদ্ধ হলো একাত্তরে। তিনটি ঘটনাতেই গরিব কৃষক-শ্রমিক আর মধ্যবিত্ত ছাত্রজনতার অভূতপূর্ব ঐক্য দাঁড়িয়েছিল। অশেষ বীরত্ব আর আত্মদানের বেদীতে যে আত্মবিশ্বাস রচিত হয়েছিল, তা-ই জন্ম দিয়েছিল বাংলাদেশের। কিন্তু নানান মধ্যবিত্ত মহল্লায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে বয়ান জোরদার বাজে, তাতে এর ছাপ কই?

সংস্কৃত নন্দনতত্ত্বে কয়েকরকম রসের কথা বলা আছে। তার মধ্যে হাস্যরস, করুণ রস, বীর রস, অদ্ভুত রস উল্লেখযোগ্য। নন্দনতত্ত্বে আছে বলে নয়, ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের মনের সংবেদনের ধরনই এই। কিন্তু এতবড় একটা যুদ্ধ জাতি করলো, যারা করলো তাদের অনেকেই জীবিত, তারপরও কেন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বীর রসের কথা নাই। বীর রসে সঞ্জিত গল্প, কবিতা, গান, নাটক বা উপন্যাস কেন এতো হাতে গোণা। কেন আমাদের দেশাত্মবোধক গানের বেশিরভাগটাই পুতুপুতু আবেগে জবজব করে। দেশটা কি ময়রার ভিয়েন যে, সবকিছুই মিস্টি শিরায় চোবানো?

কিন্তু আমরা বীরদের কথা শুনি, জানি। তারা এখন জাতীয় নায়ক। ১৬ ডিসেম্বর, ২৬ মার্চে তাদের কথা বা স্মৃতি শোনার জন্য মিডিয়া কান খাড়া করে রাখে আর জাতি শোনে। সমাজে তারা মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। তাই তাদের কথার দাম আছে, তাদের বীরত্বে আপ্লুত হওয়া চলে। সবচেয়ে বড় কথা তাদের পেছনে বড় বড় দল আছে। কিন্তু এভাবে যে মুক্তিযুদ্ধটা একটা বিশেষ শ্রেণীর হাতে চলে গেল, বাদবাকি লোকজনদের ত্যাগ ও রক্তের ছাপ যে মুছে ফেলা হলো, তার বিচার কে করবে? ইতিহাস? ইতিহাসের বিচার অনেক লম্বা–অনেক সময় লাগে তাতে। আর মোটা মোটা ইতিহাসের বই ক'জন পড়ে? অতএব নীরবতাই হীরন্ময়!

এটাও এক মনস্তত্ত্ব যে, যারা যুদ্ধ করেছিল তাদের মনের আগুন তো নিভেছেই তার স্মৃতিও আর জাগ্রত নয়। এই হলো স্বাধীনতার তিন যুগ পরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অবস্থা। অবশ্য ব্র্যাকেটের মধ্যে বলা দরকার, এই খতিয়ানের আওতা কেবল মধ্যশ্রেণী ও উচ্চবিত্তদের প্রকাশিত আচরণের মধ্যেই, সাধারণ মানুষের খোঁজ এখানে পাওয়া যাবে না। তার জন্য দরকার হবে ভিন্ন আরেক নিরিখ। কেননা সমাজের সকল স্তরে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব ও পরিণতি যেমন এক নয়, তেমনি এক নয় তা মূল্যায়নের ধরন ও ফলাফল।

তবে এটা বলা যায়, শিক্ষিত সুবিধাভোগী শ্রেণীর আবেগ ও সংবেদন যত স্যাঁতসেঁতে তাদেরটা তত নয়। এখনও তারাই কানসাটে বিদ্রোহ করে, এক বোন ইয়াসমিনের জন্য সাত ভাই প্রাণ দেয় দিনাজপুরে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। খুব উদার হিসাবে বললে, এর মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িত হয়েছিল প্রায় দশ লাখ নারী-পুরুষ। বলা হয় সেসময়ের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্যে এখন বেঁচে আছে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ। এরা যুদ্ধ দেখেছেন। এই আড়াই কোটিও বেশিদিন থাকবেন না। এদের সকলের বয়সও এখন পড়তির দিকে। এরপরে নতুন প্রজন্মের পক্ষে জানা কঠিন, সত্যিই কী হয়েছিল একাত্তরে?

কোনো এক ক্রিমিনাল এরশাদ শিকদারের ফাঁসির আদেশের পর তার জীবনী লেখা 'করুণ' কাহিনী পুস্তিকা আকারে পথে পথে বিকিয়েছিল। তার জন্যও অশ্রু ফেলেছিল কেউ কেউ। ভয় যে, কিছু না জানা অনাগত প্রজন্ম হয়তো এরশাদ শিকদারের বইয়ের পাশে মুক্তিযোদ্ধার করুণ কাহিনীকে এক জায়গায় রেখে বিচার করবে। বলা যায় না কাঁদতেও পারে। পাকিস্তানীরা বলেছিল বাঙালি নরম জাতি, 'মেয়েলি' স্বভাবের। আসুন স্বাধীন বাংলাদেশে আমরাও কেঁদে কেঁদে প্রমাণ করি আমাদের মন কত নরম। আমাদের কোমলমতি ছেলেমেয়েরা ভাববে, 'আহা! মুক্তিযোদ্ধাদের কত না কষ্ট করতে হয়েছিল!' ৩০-৩-০৬